ইউনিট
৮

কৃষিজ উৎপাদনঃ সবজি, ফুল, ফল চাষ

ভূমিকা

ফল ও সবজি অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। ফল ও সবজিতে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ উপাদান বিদ্যমান থাকায় তা মানবদেহকে রোগব্যাধির হাত থেকে সুরক্ষা করে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ২২০ গ্রাম সবজি খাওয়া প্রয়োজন কিন্তু গ্রহণ করে মাত্র ৬০ গ্রাম। ফলজাত সামগ্রী উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপিত হচ্ছে যা মানুষের কর্মসংস্থানে ও আয় বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও চিকিৎসাশাস্ত্রে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সামাজিক কর্মকান্ডে ফল ব্যবহার হয়। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে জন প্রতি ১১৫ থেকে ১২৫ গ্রাম ফল খাওয়া প্রয়োজন, কিন্তু আমরা খেতে পারছি মাত্র ৪০ থেকে ৪৫ গ্রাম। বিদেশী ফলের আমদানি কমিয়ে আমাদের প্রচলিত অপ্রচলিত সব ধরনের ফলের উৎপাদন বাড়াতে হবে। কৃষি গবেষক, কৃষি বিজ্ঞানী তথা কৃষিবিদগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে বর্তমানে বাংলাদেশে ফল ও শাকসবজির অনেক উন্নত জাত বের হয়েছে। এ সব ফল ও শাকসবজির উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচুর পুষ্টি উপাদান, পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা, দারিদ্র বিমোচন, পতিত জমির সদ্ব্যবহার, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, অধিক লাভের উৎস, বেকার সমস্যার সমাধান, নতুন শিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ, খাদ্য ঘাটতি পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় সংকোচন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আবার ফুল বা সুদৃশ্য গাছগুলো মানসিক আনন্দ দানের একটি অন্যতম উপাদান। কতগুলো ফুলে সৌন্দর্য মানুষকে চিত্তের আনন্দ দেয় আবার কতগুলো ফুলের গন্ধ খুবই মনোমুগ্ধকর। গৃহ, প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ ও মসজিদ প্রাঙ্গনে এ ফুল ও সুদৃশ্য গাছ শোভা বর্ধন করে। এই ইউনিটে ফল, ফুল ও সবজি চাষ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৮.১ : ফল শাকসবজি ও ফুলের গুরুত্ব
পাঠ - ৮.২ : পালং ও পুঁইশাক চাষ
পাঠ - ৮.৩ : কুমড়া চাষ
পাঠ - ৮.৪ : শিম চাষ
পাঠ - ৮.৫ : বেগুন চাষ
পাঠ - ৮.৬ : গোলাপ ফুল চাষ
পাঠ - ৮.৭ : বেলি ফুল চাষ
পাঠ - ৮.৮ : কলা চাষ
পাঠ - ৮.৯ : আনারস চাষ

পাঠ-৮.১ ফল ও সবজি জাতীয় ফসলের পরিচিতি ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফলের পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফলের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- সবজির গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- ফুলের পরিচিতি আলোচনা করতে পারবেন;
- ফুলের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	ফুল, ফল, সবজি, ভিটামিন, আম, কর্মসংস্থান ।

ফলের গুরুত্ব

মানুষের খাদ্য তালিকায় ফল একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে ফল যেহেতু রান্না করে খাওয়া হয় না বলে সমস্ত পুষ্টি উপাদান অবিকৃত অবস্থায় দেহ গ্রহণ করে । খাদ্য হিসেবেই নয়, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে, চিকিৎসা শাস্ত্রে, সামাজিক কর্মকান্ডে ইত্যাদিতে ফল বিভিন্নভাবে অবদান রাখছে । ফল চাষের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ।

১ । পুষ্টি সরবরাহে ফলের অবদান :

সব ফলেই সব ধরণের পুষ্টি উপাদান কমবেশি আছে । বিশেষ করে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং সর্বোৎকৃষ্ট উৎস হলো ফল । কোন ফলে কি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান অধিক রয়েছে তা থাকে তা বর্ণনা করা হলো-

শর্করা : কিসমিস, খেজুর, আম, কলা, বেল, কাঁঠাল

চর্বি : কাজু বাদাম, অ্যাভেকেডো, বাদাম, কাঠাল বীজ ইত্যাদি ।

খনিজ লবণ : খেজুর, কলা, লিচু, বেল, কাজুবাদাম

ভিটামিন : ভিটামিন এ-পাকা আম, পাকা পেঁপে, কাঁঠাল, কমলা খেজুর, ভিটামিন বি-১ (থায়ামিন)-কলা, কাজুবাদাম-ভিটামিন বি-২ বেল, পেপে, লিচু, আনার ডালিম । ভিটামিন সি-আমলকী, পেয়ারা, কমলা, লেবু ও আনারস ।

পানি- তরমুজ, নারিকেল, আনারস ।

২ । উৎপাদন বৃদ্ধিতে ফলের অবদান : দানাজাতীয় খাদ্য শস্যের গড় ফলনে চেয়ে ফলের গড় ফলন অনেক বেশি হয় ফলে কৃষক একক জায়গা থেকে লাভবান হয় ।

৩ । ফল চাষে পতিত জমি ব্যবহার : অনেক পতিত জমি, বসতবাড়ির আশে পাশে, পুকুর পাড়ে, রাস্তার পাশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন জমি যেখানে মাঠ ফসল জন্মানো সম্ভব হয় না এই সব জমি বা জায়গায় সঠিক ব্যবহার শুধু ফল গাছ লাগিয়ে সম্ভব ।

৪ । আয় বৃদ্ধিতে ফলের অবদান : দানা জাতীয় শস্য অপেক্ষা ফলের গড় ফলন বেশি তেমনি ফলের দাম ও অনেক বেশি । ফল চাষে কৃষক খাদ্য শস্যের চেয়ে ফল চাষে অনেক বেশি আয় করতে পারে । ফল বাগানে আন্ত:শস্য যেমন-আদা, হলুদ চাষ করে বাড়তি আয় করতে পারে ।

৫ । ঔষধ হিসেবে ফলে অবদান : বিভিন্ন প্রকার ফল ঔষধ হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । যেমন : পেটের পীড়ায় বেল ও পেপে খেতে বলা হয় । ত্রিফলা (আমলকি, হরিতকি ও বয়রা) বিভিন্ন রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় । ফল ছাড়াও গাছের বিভিন্ন অংশ যেমন: ছাল, পাতা, মুল ঔষধি হিসেবে ব্যবহৃত হয় ।

৬ । নতুন শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ফলের অবদান

বিভিন্ন ফল ও ফলজাত দ্রব্যের উপাদানের জন্য নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব । ফলের বাণিজ্যিক নার্সারী স্থাপনের মাধ্যমে স্বচ্ছলতা আনা সম্ভব । দেশে ফলের রস, আচার, স্কোয়াশ, জ্যাম, জেলি ইত্যাদির

জন্য নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান করলে বিদেশ থেকে এসব আমদানি করতে হবে না। এর ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এছাড়া বয়স্ক ফল গাছের কাঠ থেকে আসবাবপত্র তৈরি এবং ডালপালা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৭। জাতীয় অর্থনীতিতে ফলের অবদান

ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। বিদেশ থেকে ফল ও ফলজাত আমদানী করতে অর্থের প্রয়োজন হয়। যেখানে ফল ও ফলজাত দ্রব্য বাংলাদেশে উৎপন্ন হলে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৮। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ফলের অবদান : ফল গাছ রাস্তার দুধারে মাটি ক্ষয় রোধ করে, ছায়া প্রদান করে অতিবৃষ্টি ও ঝড়ের তীব্রতা কমায় ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।

সবজির গুরুত্ব

সবজির পুষ্টিগত গুরুত্ব

১। ক্যালরির উৎস হিসেবে : খাদ্যের তাপশক্তি আসে প্রধানত শ্বেতসার ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য থেকে। এ উপাদানগুলো সবজিতে প্রচুর পরিমাণে নেই। আমাদের দেশে আলু, মেটে আলু,মুখীকচু,ও মিষ্টি আলু ইত্যাদি কন্দাল ফসল এবং কাঁচকলার প্রধান খাদ্য উপাদান হলো শ্বেতসার। এদের ব্যবহার বৃদ্ধি করে খাদ্যকে ক্যালরিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

২। আমিষের উৎস হিসেবে : সবজি আমিষের উল্লেখযোগ্য উৎস নয়। সবজিতে আমিষের পরিমাণ গড়ে শতকরা ২ ভাগের কম।তবে সবজি অন্যান্য উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে নেয়া আমিষের আত্তীকরণ বৃদ্ধি করে।বিভিন্ন রকমের উদ্ভিজ্জ খাদ্য একত্রে মিশিয়ে খেলে একটির এমাইনো এসিডের ঘাটতি অন্যটি দ্বারা পূরণ হয়।

৩। খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ পদার্থের উৎস হিসেবে : খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ পদার্থের দিক দিয়ে পত্রবহুল সবজি খুবই সমৃদ্ধ। যে সমস্ত দেশে পুষ্টি সমস্যা নেই সেখানেও খাদ্যপ্রাণ ও খণিজ পদার্থের এক বৃহৎ অংশ আসে সবজি থেকে। খনিজ পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম ও লৌহের প্রকট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় আমাদের দেশে।তাই অধিক পরিমাণে বিভিন্ন জাতের সবজি খেলে ক্যালসিয়াম ও লৌহের অভাব বহুলাংশে দূর হবে।

সবজির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

আমাদের দেশে জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে,তাই এ অল্প জমিতে সবজি চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়। অপরদিকে সবজি স্বল্পকালীন ফসল। তাই অন্যান্য ফসলের চেয়ে অল্প সময়ে ভাল ফলন পাওয়া যায়। যেহেতু জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, সবজির চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। তাই বাড়ির আশেপাশে সবজি চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায় তাছাড়া বেকার সমস্যা দূরীকরণে সবজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।এছাড়াও কৃষিভিত্তিক কারখানা স্থাপন করেও আমরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারি। যেমন-টমেটো, বেগুন, লাউ ইত্যাদিও জুস, আচার ও মোরব্বা তৈরি করে বেশিদিন রেখে এবং অভ্যন্তরীন ও আর্ন্তজাতিক বাজারে রপ্তানি করে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

সবজির ভেষজ গুরুত্ব

সবজির অনেক ভেষজ গুন রয়েছে। সবজিতে বিভিন্ন খাদ্যপ্রান যেমন- খাদ্যপ্রান এ,বি,সি এবং ক্যারোটিন পাওয়া যায়। খাদ্যপ্রান এ-রাতকানা রোগ ও অন্ধত্ব থেকে রক্ষা করে, খাদ্যপ্রান সি-দাঁতের মাড়ি শক্ত ও মাড়ি থেকে রক্ত ঝরা বন্ধ করে। এছাড়াও স্কার্ভি ,বেরি বেরি এবং বাচ্চাদের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে বিভিন্ন সবজি। কিছু কিছু সবজি রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমান বাড়িয়ে মানুষের রক্ত চলাচল এবং রক্ত বিশুদ্ধকরণে সাহায্য করে। বিভিন্ন সবজি যেমন-পিয়াজ রক্তে কোলেষ্টেরলের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে উচ্চরক্ত চাপ কমাতে সাহায্য করে। ক্যালশিয়াম সমৃদ্ধ সবজি শিশুদের দাঁত ও হাড় গঠনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে। সবজি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং অন্ত্র ও কোলন ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে। খাদ্যপ্রান এ ও সি এন্টিঅক্সিড্যান্ট হিসেবে কাজ করে বার্ধক্য ঠেকায়।করলা ডায়াবেটিস এর মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

ফুলের গুরুত্ব

উদ্যানতত্ত্ব ফসলের মধ্যে যে সব ফসল শুধু ফুলের জন্য চাষ করা হয় তাকে ফুলজাতীয় ফসল বলে। ফুল ও সুদৃশ্য গাছপালা উৎপাদনের কলাকৌশল পুস্পোদ্যান বিদ্যা বা Floricul:ure নামে অভিহিত।

ফুল এর সৌন্দর্য ও সুগন্ধ মানুষের চিত্তের তৃপ্তিদানের অতি উৎকৃষ্ট উপাদান। পরিবেশ সৌন্দর্য বর্ধনে অনেক সুদৃশ্য গাছপালা বাগানে থাকলে তা সমাজের মানুষের আনন্দ দান করে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ফুল ব্যবহার হয়ে আসছে। যেমন জন্মদিনে, বিবাহে, অভ্যর্থনায়, শ্রদ্ধাঞ্জলিতে, বিদায়, টেবিল ও গৃহসজ্জায় প্রধান উপকরণ ফুল। ফুলদানিতে নিয়মিত টাটকা ফুল সাজিয়ে রাখা ব্যক্তির রুচিবোধের পরিচায়ক। জাপানীদের ফুলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। জাপানে পুষ্পসজ্জা শিল্প হয়ে দাড়িয়েছে। এছাড়া বাড়ির সামনে ও স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে ফুল বাগান জন সাধারণের মন: তুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়নের একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ। ফুল শুধু মনের আনন্দ দেয় না, ফুল থেকে মৌমাছি অমূল্য সম্পদ মধু সংগ্রহ করে। নানাবিধ সুগন্ধযুক্ত ফুলের নির্যাস থেকে পারফিউম, সেন্ট, আতর ইত্যাদি তৈরি হয়। অনেক উন্নত দেশে ফুল ও সুদৃশ্য গাছের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে অর্থনৈতিকভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে ফুল ফল ও সবজি বাগান পরিদর্শন করে পরিচিতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে প্রতিবেদন জমা দেবে।

সারাংশ

ফল বলতে নিষিক্ত পরিপক্ক গর্ভাশয়কে বুঝায়। নিষিক্ত পরিপক্ক গর্ভাশয় ছাড়াও বিশেষ প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ পার্থেনোজেনিটিকভাবে বা ডিম্বক সরাসরি ফলে পরিণত হয়। এগুলোকে অপ্রকৃত ফল বলে। প্রকৃত বা অপ্রকৃত ফল পরিণত বা পাকা অবস্থায় রান্না ছাড়াই খাওয়া হয় তাদেরকে উদ্যানতাত্ত্বিক ফল বলে। ফল যেহেতু রান্না করে খাওয়া হয় না তাই সমস্ত পুষ্টি উপাদান অবিকৃত অবস্থায় দেহ গ্রহণ করে। এছাড়া ঔষধি হিসেবে, সামাজিক কর্মকা- ফল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সবজির পুষ্টিজাত, অর্থনৈতিক ও ভেষজ গুরুত্বপূর্ণ অপরিসীম। উদ্যানতত্ত্ব ফসলের মধ্যে যেসব ফসল শুধু ফুলের জন্য চাষ করা হয় তাকে ফুলজাতীয় ফসল বলে। বর্ষজীবী ফুলকে শীতকালীন, গ্রীষ্মকালীন ও উভয় মৌসুমের এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। ফুল চাষের জন্য আমাদের দেশের আবহাওয়া বেশ উপযোগী তাই ফুল চাষ করে উৎপাদিত ফুল বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায় এবং আত্মকর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। প্রতিদিন আমাদের মাথাপিছু কতটুকু শাক-সবজি খাওয়া উচিত?

ক) ১০০ গ্রাম খ) ২০০ গ্রাম

গ) ২৫০ গ্রাম ঘ) ৩০০ গ্রাম।

৩। খাদ্যপ্রাণ ‘এ’ এর অভাবে কি রোগ হয়?

ক) বেরিবেরি খ) চর্মরোগ

গ) রাতকানা ও অন্ধত্ব ঘ) হাড়ের ক্ষয় রোগ।

পাঠ-৮.২ পালং শাক ও পুঁইশাক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পালং শাক ও পুঁইশাকের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- পালং শাক ও পুঁইশাকের পরিবেশগত চাহিদা বলতে পারেবন;
- পালং শাক ও পুঁইশাকের চাষাবাদ প্রণালী লিখতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	পালং শাক, পুঁই শাক, পাতাজাতীয় সবজি

পালং শাক

পালংশাক অত্যন্ত পুষ্টিকর, ভিটামিন সমৃদ্ধ ও সুস্বাদু পাতা জাতীয় শীতকালীন সবজি । শীতকালে বাজারে প্রচুর পালংশাক পাওয়া যায় । এটি বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় পাতা সবজি ।

জলবায়ু ও মাটি

এটি বাংলদেশে শীতকালে চাষাবাদ করা হয় । উর্বর দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটিতে চাষাবাদ করা যায় ।

জাত

সবুজ বাংলা, টক পালং, গ্রিণ, কপি পালং, পুষা জয়ন্তী । এছাড়া আছে নবেল জায়েন্ট, ব্যানার্জি জায়েন্ট, পুষ্প জ্যোতি ।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমির আগাছা তুলে জমি ভালোভাবে চাষ দিয়ে ও পরে মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে ।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	শতক প্রতি
গোবর	৫০ কেজি
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এম ও পি	৫০০ গ্রাম

ইউরিয়া বাদে সব সার জমি তৈরি সময় দিয়ে দিতে হয় । ইউরিয়া সার চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর থেকে এক বা একাধিকবার প্রয়োগ করতে হবে ।

বীজের হার ও বপন

ভালোজাতের বীজের ক্ষেত্রে শতক প্রতি ২৫০-৩০০ গ্রাম লাগে । পালংশাক সারিতে ও ছিটিয়ে বপন করা যায় । বীজ বপনের পূর্বে ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে । বীজ বপনের পর অঙ্কুরোদগমে প্রায় ৭-৮ দিন সময় লাগে ।

পরিচর্যা

জমির আগাছা তুলে ফেলতে হবে । পালংশাক রসালো প্রকৃতির বলে প্রচুর পানির প্রয়োজন তাই পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে । মাটি শক্ত হয়ে গেলে মাটি আলগা করে দিতে হবে । বীজ গজানোর ১০-১২ দিন পর অতিরিক্ত চারা উঠিয়ে ফাঁকা জায়গা লাগিয়ে দিতে হবে ।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

পালংশাকে পাতা ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়। এছাড়াও উড়চুঙ্গা, উঁইপোকা ও পিঁপড়ার আক্রমণ হতে পারে। পোকার আক্রমণ বেশি হলে স্থানীয় অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পালংশাকের গোড়া পঁচা রোগ, পাতা ধ্বসা রোগ ডাউন মিলভিউ ও পাতায় দাগ রোগ হতে পারে। রোগ দমনে জন্য নিয়মানুযায়ী ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

সংগ্রহ

ফুল না আসা পর্যন্ত পালংশাক সংগ্রহ করা যায়। ফলন প্রতি শতকে ২৫-৪০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

পুঁইশাক

পুঁইশাকের ইংরেজি নাম হল Indian Spinach। পুঁইশাক গ্রীষ্মকালীন পাতা জাতীয় সবজির মধ্যে অন্যতম। পুঁইশাক যদিও গ্রীষ্মকালে পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে তবে সারা বছর ধরেই পাওয়া যায়। এর স্বাদ উৎকৃষ্ট ও এর পাতায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বি, সি, ক্যালসিয়াম ও লৌহ থাকে।

জলমায়ু ও মাটি

পুঁইশাক উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে ভালো জন্মে। এটি যে কোন জায়গায় জন্মাতে পারে। বন্যামুক্ত অর্থাৎ পানি জন্মে না এরকম জমিতেও পুঁইশাকের চাষ করা যেতে পারে।

জাত

স্থানীয় সবুজ ও লাল সাধারণত দুটি জাত দেখা যায়। লাল জাতের তুলনায় সবুজ জাত দ্রুত বাড়ে এবং ফলন বেশি। তবে লাল জাতের স্বাদ ও পুষ্টিমান বেশি।

বংশ বিস্তার

বীজ বা কান্ডের সাহায্যে বংশ বিস্তার করে থাকে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করার জন্য বীজের মাধ্যমে চাষাবাদ করে থাকে।

বীজের পরিমাণ

সারিতে বীজ বপনের জন্য প্রতি হেক্টরে ১.৫-৩ কেজি বীজ প্রয়োজন। তবে ছিটিয়ে বপনের জন্য বেশি বীজের প্রয়োজন।

বীজ লাগানোর সময়

পুঁইশাক সাধারণত এপ্রিল - মে পর্যন্ত চাষাবাদ করা হয়। সেচের ব্যবস্থা করা গেলে রবি মৌসুমেও করা যায়।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

বীজ বা চারা রোপনের পূর্বে জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। চাষের সময় গোবর সার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। মাঝারি উর্বর জমির জন্য শতক প্রতি গোবর সার ৫০ কেজি, টিএসপি ও এমওপি ৫০০ গ্রাম করে শেষ চাষের সময় মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার ১ কেজি চারা গজানোর ৮-১০ দিন পর থেকে ২-৩ কিস্তিতে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

বীজ ও চারা রোপন

পুঁইশাক দু'ভাবে চাষ করা যায়। প্রতি বেডে ৭৫ সে.মি. দূরে দূরে ২টি সারিতে ৪৫ সে.মি.পরপর ২-৩ সে.মি. গভীরে ২-৩টি বীজ বা ১ টি চারা রোপন করতে হবে। বর্ষার সময় পুঁইশাকের লতা কিছু অংশ কেটেও রোপন করে চাষ করা যায়।

পরিচর্যা

প্রয়োজনে আগাছা তুলে ফেলতে হবে। আগাছা দমন, সারের উপরি প্রয়োগ এবং গাছের গোড়ায় মাটি দেয়ার কাজ একই সময়ে করা যেতে পারে। বেড ও নালা পদ্ধতিতে চাষ করলে জমিতে সমভাবে সেচ দেয়া যায়। পুঁইশাকে তেমন মারাত্মক

কোন রোগ ও পোকার আক্রমণ দেখা যায় না। তবে বিছা পোকা পাতা ও কান্ড খেয়ে ক্ষতি করে। পাতা পঁচা রোগ হলে ছত্রাক নাশক স্প্রে করা যেতে পারে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

পুঁইশাকের ডগা ২৫-৩০ সে.মি. লম্বা হলেই ডগা কেটে সংগ্রহ করতে হবে। এভাবে ডগা কাটলে নতুন নতুন ডগা গজাবে। এভাবে কয়েকবার ডগা কাটা যায়। প্রতি হেক্টরে ৬০-৭৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পুঁই শাকের ও পালং শাকের চাষাবাদ প্রণালি বর্ণনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

পালং ও পুঁইশাক অত্যন্ত পুষ্টিকর পাতাজাতীয় সবজি। পালং শাক সাধারণত: শীতকালে চাষ করা হয়। পুঁইশাক গ্রীষ্মকালে চাষ করা হয়। পুঁইশাকের লাল ও সবুজ দুই ধরণের জাত রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। পালংশাক কোন মৌসুমে চাষ করা হয়?

ক) বর্ষাকাল খ) শীতকাল

গ) গ্রীষ্মকাল ঘ) সারা বছর

২। পালংশাকের বীজবপনের আগে কত সময় পর্যন্ত বীজ ভিজিয়ে রাখতে হয়

ক) ৮ ঘন্টা খ) ২ ঘন্টা

গ) ২৪ ঘন্টা ঘ) ৫ ঘন্টা

৩। পুঁইশাকের সাধারণত: কয় ধরনের জাত আছে?

ক) দুই ধরনের খ) তিন ধরনের

গ) চার ধরনের ঘ) পাঁচ ধরনের

পাঠ-৮.৩ কুমড়া চাষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিভিন্ন ধরণের কুমড়া সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মিষ্টি কুমড়ার উৎপাদন মৌসুম ও জলবায়ুর চাহিদা বলতে পারবেন।
- মিষ্টি কুমড়ার চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মিষ্টি কুমড়ার সংগ্রহ ও ফলন আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	কুমড়া, মাদা, ফলের মাছি পোকা।

কুমড়া জাতীয় সবজি

কুমড়া বাংলাদেশের একটি পরিচিত সবজি। বিভিন্ন ধরণের কুমড়া জাতীয় গোত্রের সবজিগুলো হল- মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, লাউ, তরমুজ, শসা, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা ইত্যাদি। এই পাঠে মিষ্টি কুমড়া সম্পর্কে জানব।

মিষ্টি কুমড়া

কুমড়া গোত্রীয় সবজির মধ্যে মিষ্টি কুমড়া বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মিষ্টি কুমড়া কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও খনিজ সমৃদ্ধ। মিষ্টি কুমড়ার পাতা ও কচি ডগা খাওয়া যায়।

জলবায়ু ও মাটি

জলবায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক হলে মিষ্টি কুমড়া ভালো হয়। প্রচুর সূর্যালোক সমৃদ্ধ, বন্যামুক্ত ও সুনিষ্কাশিত দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ মাটি মিষ্টি কুমড়া চাষের জন্য উপযোগী।

জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ২টি উচ্চফলনশীল ও উচ্চগুণ সম্পন্ন মিষ্টিকুমড়া জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন-বারি মিষ্টিকুমড়া-১, বারিমিষ্টিকুমড়া-২। বাংলাদেশ স্থানীয় জাতের চাষাবাদ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের সীড কোম্পানির উচ্চ ফলনশীল জাত ও চাষ করে থাকে।

বংশ বিস্তার ও বীজ লাগানোর সময় ও পরিমাণ

বীজের মাধ্যমেই সাধারণত: বংশ বিস্তার করা হয়। মিষ্টি কুমড়া সারা বছরই চাষ করা যায়। তবে এপ্রিল-ম খরিপ মৌসুমে ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর রবি মৌসুমে বীজ বুনতে হয়। বীজের পরিমাণ প্রতি মাদায় ৩-৫টি বীজ বপন করতে হয়।

মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ

মাদা তৈরি জন্য ২.৫-৩.০ মিটার দূরত্বে ৪.৫ সে.মি. গভীর করে গর্ত করে বীজ বুনতে হয়। মাঠে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের বেলায় প্রথমে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরী করে প্রতি বেডে সারি তৈরি করে ১.৫ - ৩.০ মি. পরপর মাদা তৈরি করে বীজ বুনতে হবে। দুই মাদার মাঝখানে ৬০ সে.মি. প্রস্থ সেচ ও নিষ্কাশন নালা তৈরি করতে হবে।

নিম্নবর্ণিত তালিকা অনুযায়ী গর্তে সার প্রয়োগ করতে হবে:

সারের নাম	গর্ত প্রতি পরিমাণ	বিঘা প্রতি পরিমাণ
গোবর/কম্পোষ্ট	১০ কেজি	৬৯০ কেজি
ইউরিয়া	-	-
টিএসপি	২০০ গ্রাম	১১.৫ কেজি
এমওপি	১৫০ গ্রাম	৭ কেজি
জিপসাম	৯০ গ্রাম	১৩ কেজি
দস্তা	৫ গ্রাম	১.৬ কেজি

প্রয়োগ পদ্ধতি

ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার বীজ বোনার ৮-১০ দিন আগে মাদার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার চারা গজানোর ৮-১০ দিন থেকে ১০-১২ দিন পরপর ২-৩ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ (মাদার চারদিকে অগভীর নালা কেটে নালার মাটির সাথে মিশ্রিত করে) করতে হবে।

উৎস : ১. উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি, ২০০৬-২০০৭, BARI, ২০০৮

অন্যান্য পরিচর্যা

শুষ্ক মৌসুমে মিষ্টি কুমড়ার ক্ষেতে বিশেষ ভাবে ফুল ফোটা ও ফল ধরার সময় সেচ দিতে হবে। কুমড়া চাষে মাচার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মাচা তৈরিতে খরচ বেশি বলে মাচার পরিবর্তে ধানের খড় বিছিয়ে দেয়া হয়। ফল ধরলে ফলের নিচে কিছু খড় দিতে হবে যাতে মাটির সংস্পর্শে না আসে। ভোর বেলা মিষ্টি কুমড়ার কৃত্রিম পরাগায়ণের জন্য পুরুষ ফুলের পরাগধানী হাতে নিয়ে ফুলের গর্ভমুন্ডে আলতো ভাবে ২-৩ বার ঘসে দিলে অধিক ফল ধারণে সহায়ক হয়। পোকামাকড়ের মধ্যে ফলের মাছি পোকা, জাব পোকা, লাল কুমড়া বিটল উল্লেখযোগ্য। পোকা ধরার ফাঁদ ব্যবহার করে ফলের মাছি পোকা দমন করা যায়। কুমড়ার রোগের মধ্যে পাউডারি মিলডিউ হলে পাতার উপর সাদা পাউডার দেখা যায় এবং পাতা নষ্ট হয়ে যায়। ২ গ্রাম থিওভিট বা টিল্ট বা টিল্ট ০.৫ মিলি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

সাধারণত: চারা বের হওয়ার ২-৩ মাসের মধ্যে ফুল আসে। ফল পরিপক্ক বা খাওয়ার উপযোগী হলেই ফল সংগ্রহ করতে হবে। ফলন হেক্টর প্রতি ১৫-৩০ টন পর্যন্ত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মিষ্টি কুমড়ার বাগান পরিদর্শন করে চাষপদ্ধতির উপর একটি প্রতিবেদন জমা দিবে।

সারসংক্ষেপ

কুমড়া বাংলাদেশের একটি পরিচিত সবজি। কুমড়া গোত্রীয় সবজির মধ্যে মিষ্টি কুমড়া গুরুত্বপূর্ণ। মিষ্টিকুমড়া প্রচুর ভিটামিন এ ও খনিজ লবণ আছে। মিষ্টি কুমড়া সারাবছরই চোষ করা যায়। প্রতি হেক্টরে ৫-৬ কেজি বীজের প্রয়োজন। মিষ্টি কুমড়ায় কৃত্রিম পরাগায়ণের ব্যবস্থা করতে পারলে ফলন ভালো হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কুমড়া জাতীয় গোত্রের সবজি হলো-

ক) বেগুন খ) শসা

গ) আলু ঘ) টমেটো

২। কখন মিষ্টি কুমড়ার কৃত্রিম পরাগায়ণ উপযোগী?

ক) ভোর বেলা খ) দুপুর বেলা

গ) বিকেল বেলা ঘ) রাতে

৩। পোকা ধরার ফাঁদ ব্যবহার করলে কুমড়ার কোন পোকা দমান করা যায়।

ক) লাল কুমড়া বিটল খ) জাব পোকা

গ) ফলের মাছি পোকা ঘ) পিঁপড়া

পাঠ-৮.৪ শিম চাষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিমের জাত সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- শিমের উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- শিমের আন্ত:পরিচর্যা ও রোগ বালাই সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	দিবস দৈর্ঘ্য, দিবস নিরপেক্ষ, অঙ্গজ বৃদ্ধি ।

শিম আমিষ সমৃদ্ধ একটি সবজি । শিম এবং এর বীজ উভয়ই জনপ্রিয় শীতকালীন সবজি । এটি উচ্চ আঁশযুক্ত, ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ যা মানুষের জন্য খুবই উপকারী । এর মূলে নডিউল জাত আছে তা বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেন সংবদ্ধ করে নাইট্রোজেন মাটিতে যুক্ত করতে পারে ।

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি শিম-১, বারি শিম-২, বারি শিম-৩, বারি শিম-৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভাবিত ইপসা শিম, এছাড়া কার্তিকা, বারমাসি জনপ্রিয় জাতের মধ্যে অন্যতম । এছাড়াও বিভিন্ন বীজ কোম্পানি থেকে নিত্য নতুন জাত বাজারজাত করছে ।

জলবায়ু ও মাটি

শিম শীতকালীন এবং খরা সহিষ্ণু সবজি । দোআঁশ মাটি শিমের জন্য ভালো তবে সার ও পানি ব্যবস্থাপার মাধ্যমে যেকোন মাটিতে ভালো জন্মে । মাটির pH ৬.৫-৮.৫ হলে ভালো । ফসলের অঙ্গজবৃদ্ধি ও পুষ্পায়ন জন্য তাপমাত্রা ও দিবস দৈর্ঘ্য যথেষ্ট প্রভাব ফেলে । এ সবজি গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং দীর্ঘ দিবস প্রয়োজন । কিন্তু প্রজননের জন্য নিম্ন তাপমাত্রা ও কম দিবস দৈর্ঘ্য প্রয়োজন । শীতকালীন জাতগুলোতে কেবল শীতের প্রভাবেই পুষ্পায়ন ঘটে গ্রীষ্মকালীন জাতগুলো দিবস নিরপেক্ষ হওয়ায় বছরের যে কোনো সময় বীজ বপন বা চারা রোপন করা হউক না কেন যথাসময়ে পুষ্পায়ন ঘটে থাকে ।

সার প্রয়োগ, জমি তৈরি ও বপন পদ্ধতি

বানিজ্যিকভাবে আবাদের জন্য ৪-৫ বার জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দিতে হবে । এছাড়াও কৃষক তার বসত বাড়িতে, পতিত জমি, পুকুর পাড়ে রাস্তার ধারে শিমের চাষ করতে পারে । সাধারণত মাদা বা গর্ত করতে হবে । মাদা থেকে মাদা ৩ মিটার দূরত্ব রাখতে হবে । আগাম বীজ বপনের জন্য জুন মাস উত্তম । তবে স্বাভাবিক ভাবে জুনের শেস সপ্তাহ থেকে জুলাই পর্যন্ত বীজ বপন করা যায় । বীজের হার হেক্টর প্রতি ৭-৭.৫ কেজি যা নির্ভর করে বীজ বপনের সময়ের উপর । প্রতি মাদায় ৫-৬ টি বীজ বপন করতে হবে । পরবর্তীতে ২ টি সুস্থ চারা রেখে অন্যগুলো তুলে ফেলতে হবে । প্রায় সব ধরণের মাটিতেই শিম জন্মে । তবে সুনিষ্কাশিত দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে ভালো ফলনের উপযুক্ত ।

বীজ বপনের সময়

মধ্য জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস ।

বীজ হার

প্রতি শতকে	প্রতি একরে	প্রতি হেক্টরে
৩০ গ্রাম	৩ কেজি	৭.৫ কেজি

উৎস : উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি (২০০৬-০৭), জানুয়ারি-২০০৮

জমি, মাদা ও গর্ত তৈরি

৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে ঢেলা ভেঙ্গে জমি সমান করে ঝুর ঝুরে করে নিতে হয়। তারপর ২.৫-৩ মিটার দূরে দূরে এমনভাবে মাদা তৈরি করতে হবে যাতে মাদা উচ্চতায় ১৫-২০ সেমি, প্রস্থে ২.৫ মিটার, এবং দৈর্ঘ্য জমির সুবিধা মতো নিতে হয়। প্রতি মাদার গর্তের আকার হবে ৪৫ সেমি × ৪৫ সেমি × ৪৫ সেমি।

গর্তে সার প্রয়োগ

প্রতিটি গর্তে নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করতে হয়:

সারের নাম	হেক্টর প্রতি	গর্ত প্রতি
গোবর	১০ টন	১০ কেজি
ইউরিয়া	২৫ কেজি	-
টিএসপি	৯০ কেজি	১১৫ কেজি
এমওপি	৬০ কেজি	৭০ গ্রাম
জিপসাম	৫ কেজি	৫ গ্রাম
বোরন সার	৫ কেজি	৫ গ্রাম
ছাই	-	২ কেজি
খৈল	-	২০০ গ্রাম

উৎস : ১. উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি (২০০৬৯-০৭), জানুয়ারি-২০০৮

২. শাক সবজির চাষ, কৃষি কথা (২য় সংস্করণ-১৯৮৭)।

গোবর, সালফার, বোরন ও টিএসপি সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। শিম জাতীয় ফসলে ইউরিয়া সার কম প্রয়োগ করতে হয়। কারণ শিম লিগুম পরিবারের ফসল অর্থাৎ ডাল জাতীয় ফসল। এদের শিকড়ে গুটি (Nodule) তৈরি হয় যাতে প্রচুর পরিমাণে বায়ু মন্ডলীয় নাইট্রোজেন জমা থাকে।

মাদায় বীজ বপন

গর্তে সার প্রয়োগের ৪-৫ দিন পর প্রতি মাদায় ৪-৫টি বীজ বপন করতে হবে।

আন্তঃ পরিচর্যা

- আগাছা দমন : জমিতে বা মাদায় আগাছা দেখামাত্রই সরিয়ে ফেলতে হবে।
- চারা পাতলা করণ : প্রতি মাদায় ২টি সুস্থ, সবল চারা রেখে বাকিগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।
- মাচা তৈরি : গাছ ২৫-৩০ সেমি উঁচু হলেই মাচা বা বাউনি তৈরি করে তাতে গাছগুলো উঠিয়ে দিতে হবে।
- সেচ প্রদান : গাছের গোড়ার মাটির রস যাচাই করে সেচ দিতে হবে। সাধারণত: ১০-১২ দিন পরপর গাছে সেচ দিতে হবে।
- গোড়ায় মাটি উঠানো : গাছের গোড়ায় মাটি উঠিয়ে দিতে হবে যাতে বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় পানি না উঠতে পারে।
- প্রুনিং করা : পুরাতন পাতা ও ফুলবিহীন ডগা বা শাখা কেটে ফেলতে হবে।
- সারের উপরি প্রয়োগ : বীজ বপনের ১ মাস পর অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেরক এমওপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। চারা বড় হতে থাকলে আরও ১৫-২০ দিন পর বাকি ইউরিয়া ও এমওপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

পোকা ও দমন পদ্ধতি

জাব পোকা : শিমের প্রধান ক্ষতিকারক পোকা হলো জাব পোকা (Aphid)। এরা গাছের কচি ডগা, পাতা, ফুল ও ফল ইত্যাদির রস চুষে খায়। ফলে ফলনের মারাত্মক ক্ষতি হয়। সরাসরি ক্ষতি ছাড়াও এ সব পোকা মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

ফল ছিদ্রকারী পোকা : শিমের আর একটি ক্ষতিকারক পোকা হলো ফল ছিদ্রকারী পোকা। এ সব পোকার ডিম থেকে বের হয়ে আসা কীড়া ফুল, ফুলের কুঁড়ি, কচি ফল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে পড়ে।

থিপস (Thrips): শিমের আর একটি ক্ষতিকর পোকা হলো থ্রিপস। এ সব পোকার আক্রমণে শিমের উৎপাদন ব্যাপক হারে হ্রাস পাবে। এ সব পোকা পাতা থেকে রস চুষে খায়।

পোকা দমন পদ্ধতি : উল্লেখিত পোকা ৩টির প্রতিকারের জন্য নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে:

আক্রান্ত অংশ তুলে ফেলে দিতে হবে। গুড়া সাবান পানিতে মিশ্রিত করে স্প্রে করতে হবে। আঠা ফাঁদ পেতে অর্থাৎ জমিতে ৩ মিটার দূরে দূরে ৩০ সেমি × ৩০ সে.মি. আকারের বোর্ডে গ্রিজ/আঠা লাগিয়ে আঠা ফাঁদ পেতে থ্রিপস পোকাকে আকৃষ্ট করে মারা যায়। গাছগুলো আক্রান্ত বেশি হলে মেলাথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক (২ মিলি) ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। নিমের বীজের শাস পিষে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়। ভাইরাস আক্রান্ত গাছগুলো মাটিসহ উঠিয়ে গভীর গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।

রোগ ব্যাধি ও দমন ব্যবস্থা

শিম গাছে এনথ্রাকনোজ বা ফল পঁচা রোগ হয়। এ রোগ দমনে রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে। ছত্রাক নাশক যেমন- ব্যাভিস্টিন/নোইন/একোনাজল প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

আশ্বিন-কার্তিক মাসে শিম গাছে শিম ধরে। জাত ভেদে বীজ বপনের ৯৫-১৪৫ দিন পর শিম গাছ থেকে শিম ওঠানো যায়। বীজ হিসেবে শিম সংগ্রহ করতে হলে শিম যখন গাছে শুকিয়ে হলদে বর্ণ হয়, তখন সংগ্রহ করা হয়। শিম থেকে বীজ বের করে তা নিমের শুকনা পাতার গুড়াসহ সংরক্ষণ করতে হয়।

ফলন

জাত ভেদে শিমের ফলনের তারতম্য হয়ে থাকে। সবজি হিসেবে শিম পুরা মৌসুমে উঠানো যায়। নিম্নে বারি (BARI) শিমের ফলনের তালিকা দেয়া হলো:

জাত	শতক প্রতি	একর প্রতি	হেক্টর প্রতি
বারি শিম-১	৮-১২ কেজি	৯০-১০৮ মন	২-৩ টন
বারি শিম-২	৬০-৮০ কেজি	৪১-৫৪ মন	১৫-২০ টন

উৎস : ১. উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি (২০০৬-০৭), জানুয়ারি - ২০০৮

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী শিম চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

শিম আমিষ জাতীয় একটি জনপ্রিয় সবজি। শিম গাছের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ, আর্দ্র জলবায়ু ও দীর্ঘ দিবস প্রয়োজন। কিন্তু পুষ্পায়নের জন্য নিম্ন তাপমাত্রা ও কম দিবস দৈর্ঘ্য প্রয়োজন। সবজি হিসেবে শিম পুরো মৌসুমে উঠানো যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। শীতকালীন শিমের পুষ্পায়নের জন্য কেমন আবহাওয়া প্রয়োজন?

ক) দীর্ঘ দিবস ও উচ্চ তাপমাত্রা খ) কম দীর্ঘ দিবস ও নিম্ন তাপমাত্রা
গ) উচ্চ আর্দ্রতা ঘ) উচ্চ তাপমাত্রা

২। শিমের প্রধান ক্ষতিকর পোকা?

ক) জাব পোকা খ) লেডি বার্ড বিটল
গ) বিছা পোকা ঘ) ছত্রাক পোকা

পাঠ-৮.৫ বেগুন চাষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বেগুনের জাত সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- বেগুনের জলবায়ু ও মাটি, বংশবিস্তার রোপন উল্লেখ করতে পারবেন।
- বেগুনের সার, রোগবালাই সহ এর আন্তঃ পরিচর্যা বর্ণনা করতে পারেবন।

	মুখ্য শব্দ	বেগুন, কান্ড ও ফল ছিত্রকারী পোকা, গোড়া পচা।

বেগুন সারা বছর পাওয়া যায়। সবজির মধ্যে বাংলাদেশে উৎপাদনের দিক থেকে বেগুনের স্থান উল্লেখযোগ্য। তবে শীত মৌসুমে এর ফলন বেশি হয়।

জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) কর্তৃক কিছু জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। সেগুলো হলো বারি বেগুন-১ (উত্তরা), বারি বেগুন-২ (তারাপুরী), বারি বেগুন-৪ (কাজলা), বারি বেগুন-৫ (নয়নতারা), বারি বেগুন-৬, বারি বেগুন-৭, বারি বেগুন-৮, বারি বেগুন-৯, বারি বেগুন-১০। এছাড়াও খটখটিয়া, ইসলামপুরী, মুক্তকেশী, চিত্রা, পুরাক্রান্তি, শিংনাথ।

জলবায়ু ও মাটি

বেগুন উষ্ণ জলাবায়ুর ফসল হলেও ফল ধারণের উপযুক্ত ১৫-২০° সেঃ। বাংলদেশে শীত মৌসুমে এর ফলন ভালো হয়। দোআঁশ, বেলে দোআঁশ, এঁটেল দোআঁশ ও পলি মাটি বেগুন চাষের জন্য সবচেয়ে ভলো।

বীজ বপনের সময়

বেগুনের চারা উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শীতকালীন বেগুন চাষের জন্য জুলাই মাসের মাঝামাঝি হতে সেপ্টেম্বর মাস এবং বর্ষাকালীন বেগুন চাষের জন্য ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত বীজ বপন করা হয়।

বীজ তলায় চারা উৎপাদন

বীজতলা সমপরিমাণ বালি, কম্পোষ্ট ও মাটি মিশিয়ে ঝুর ঝুরে করে তৈরি করতে হয়। গ্রীষ্মকালীন বেগুন চাষের জন্য মার্চ-এপ্রিল মাসে বীজ বপন করা যায়।

বীজ হার

প্রতি হেক্টরের জন্য ১২০-১৪০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়।

জমি তৈরি

জমিতে ৪-৫টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুর ঝুরে করে করতে হয়। ভালো ফসল পেতে হলে জমি গভীর ভাবে চাষ করতে হবে।

সার প্রয়োগ ও নিয়মাবলী

সারের নাম	হেক্টর প্রতি	শতক প্রতি	একক প্রতি
১	২	৩	৪
ইউরিয়া	৩৭০-৩৮০ কেজি	১ কেজি	১ মন ৩ সের
টিএসপি	১৪৫-১৫৫ কেজি	৫০০ গ্রাম	১ মন ৩ সের
এমওপি	২৪০-২৬০ কেজি	৫০০ গ্রাম	২ মন ৬ সের
গোবর	৮-১২ টন	৪০ কেজি	১০০-১৫০ মন

উৎস : ২. কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, BARI, ৩য় সংস্করণ-২০০৫
৪. শাকসবজি চাষ, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২য় সংস্করণ-১৯৮৭

ইউরিয়া ছাড়া সব সার জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে গোবর জমি তৈরি প্রথম দিকে প্রয়োগ করা উত্তম। ইউরিয়া সার চারা গজানোর ৮-১০ দিন পর থেকে ১০-১২ দিন পরপর ২-৩ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

চারা রোপণ

বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর চারা রোপনের উপযোগী হয়। চারা কাঠির সাহায্যে তুলতে হবে। চারা গাছের শিকড়ের যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এরপর ৭৫ সেমি দূরত্বে সারিতে ৬০ সে.মি. দূরে দূরে চারা রোপণ করতে হবে।

রোগ দমন

বেগুনের রোগের মধ্যে গোড়া পঁচা রোগ অন্যতম। এছাড়াও ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট ও খাটো আকৃতির পাতা রোগ দেখা যায়। গোড়া পঁচা রোগের জন্য ভিটাভেক্স-২০০ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

যাহোক নিম্নলিখিত প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুনের বালাই (রোগ ও পোকা) দমন করা যায়:

- কলম চারা ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুনের উইল্ট রোগ দমন করা যায়।
- শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ একই জমিতে বেগুন/টমেটো রোপন করা যাবে না।
- বেগুনের মাছি পোকা দমনের জন্য ফেরোমন ও মিষ্টি কুমড়ার ফাঁদ ব্যবহার করেত হবে।
- মুরগির পচনকৃত বিষ্ঠা ও সরিষার খৈল ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন সবজি যেমন- বেগুন, টেমেটো, শশা, বাঁধাকপি ফসলের মাটি বাহিত রোগ দমন করা যায়।
- রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করতে হবে। যেমন- বারি বেগুন-১, বারি বেগুন-৫, বারি বেগুন-৬, বারি বেগুন-৭।
- পোকার আক্রমনমুক্ত চারা রোপন করতে হবে।
- সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।
- দ্রুত আগাছা দমন ও মালচিং করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন :

চারা রোপনের ৩০ দিন এর বেশি সময় পর ফুল আসে এবং এরও প্রায় ৩০ দিন পর ফল সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত হেক্টর প্রতি ৩০-৪৫ টন বেগুনের ফলন হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী বেগুন উৎপাদন কৌশল বর্ণনা করবে।

সারসংক্ষেপ

সবজির মধ্যে বেগুন একটি অতি পরিচিত জন প্রিয় সবজি। বেগুনের ফল ধারনের উপযুক্ত তাপমাত্রা ১৫-২০° সে। দোঁ-আশ ও বেলে দোঁ-আশ মাটি বেগুন চাষের জন্য ভালো। প্রতি হেক্টর ১২০-১৪০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন। বেগুনের প্রধান শত্রু ডগাও ফলছিদ্রকারী পোকা। রোগের মধ্যে গোড়া পচা অন্যতম। ফলন হেক্টর প্রতি ৩০-৪০ টন হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। বেগুনের ফল ধারনের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা কত?

ক) ৩০-৪০° সে. খ) ১৫-২০° সে

গ) ৫-১০° সে ঘ) ১০-১৫° সে

২। বেগুনের সবচেয়ে প্রধান শত্রু কোন পোকা?

ক) পামরি পোকা খ) মাজরা পোকা

গ) ডগা ও ফল ছিত্রকারী পোকা ঘ) লেডি বার্ড বিটল।

৩। বেগুনের বীজ হার হেক্টর প্রতি কত?

ক) ১২০-১৪০ গ্রাম খ) ১৫০-১৬০ গ্রাম

গ) ৫০-৬০ গ্রাম ঘ) ২০০-৩০০ গ্রাম।

পাঠ-৮.৬ গোলাপ ফুলের চাষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- গোলাপ ফুলের জাতের নাম বলতে পারবেন।
- গোলাপের চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- গোলাপের পোকামাকড় ও রোগ জীবাণু নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকার করতে পারবেন।
- গোলাপের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ফুলের রাণী, কাট ফ্লাওয়ার, চোখ কলম, প্রুণিং

ভূমিকা

ফুল বা সুদৃশ্য গাছপালা উৎপাদনের জ্ঞান ফ্লোরিকালচার বা পুষ্পোদ্যান বিদ্যা নামে পরিচিত। ফুল মানসিক আনন্দ দানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কতগুলো ফুলের সৌন্দর্য মানুষ আকৃষ্ট করে। আবার কতগুলো ফুলের গন্ধ খুবই মনোমুগ্ধকর। ফুল গৃহ, স্কুল কলেজ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শোভা বর্ধনের জন্য খুবই প্রয়োজন। ফুল শুধু মানুষের মনতুষ্টির জন্যও নয় এর অর্থনৈতিক অবদান অপরিসীম। বর্তমানে বাংলাদেশে ফুল ও সুদৃশ্য গাছ বাণিজ্যিক উৎপাদন বিশেষ ভাবে গোলাপ চোখে পড়ছে। এছাড়াও বিভিন্ন সুগন্ধি প্রস্তুতি ফুলের নির্যাস ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গোলাপ ফুলকে ফুলের রাণী বলা হয়ে থাকে। এর কোমলতা, বর্ণ, সুগন্ধ এমন কেউ নেই যাকে আকৃষ্ট করে না। সাজ সজ্জায় কাটা ফুল হিসেবে কদর রয়েছে। এছাড়া সুগন্ধি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

জাত : পৃথিবী জুড়ে গোলাপের অসংখ্য জাত রয়েছে। জাতগুলোর কোনোটির গাছ বড়, কোনোটি ঝোপালো, কোনোটি লতানো। জাত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গোলাপ সাদা, লাল, হলুদ, কমলা, গোলাপী এবং মিক্স রঙের হয়ে থাকে। এছাড়াও রানী এলিজাবেথ (গোলাপী), ব্ল্যাক প্রিন্স (কালো), ইরানি (গোলাপী), মিরিন্ডা (লাল), দুই রঙা ফুল আইক্যাচার চাষ করা হয়। যাহোক গোলাপ ফুলকে অনেক শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। তবে উল্লেখযোগ্য শ্রেণিগুলো হলো:

১) হাইব্রিড টি (Hybrideas) : ফুলগুলো বেশ বড়, সুগঠিত ও অনেক পাপড়ি বিশিষ্ট। কাটা ফুল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: ক্রিমশন গোরি, পাপা মিল্যান্ড, টিপটিপ ইত্যাদি এ শ্রেণির জাত।

২) পলিয়েন্থা (Polyanha): ফুলগুলো আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট এবং বড় বড় থোকায় ধরে। যেমন: জর্জ এলগার, ক্যামিও, আইডিয়াল ইত্যাদি।

৩) ফ্লোরিবান্দা (Floribunda) : ফুলগুলো আকারে ছোট এবং থোকায় ধরে। কাটা ফুলের জন্য চাষ করা হয়। যেমন: হানিমুন, সানসিল্ক ইত্যাদি।

৪) মিনিয়েচার (Miniaure) : গাছ ছোট, পাতা ছোট এবং ফুল ছোট হয়। যেমন: রাজিনা, গোল্ডেন, ইয়ালো ডল ইত্যাদি।

মাটি, জলবায়ু ও জমি নির্বাচন

গোলাপের জন্য রৌদ্যজ্জল, সুনিষ্কশিত ও জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ মাটি গোলাপ চাষের জন্য উত্তম। মাটির পিএইচ ৬.০-৭.৫ এর মধ্যে হওয়া উচিত। পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে এ ধরনের স্থান পরিত্যাগ করা উচিত।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

সাধারণত রোপণের পূর্বে ২-৩ সপ্তাহ পূর্বে জমি ভালভাবে চাষ করতে হবে এবং এরপর মই দিয়ে সমান করে ৬.০ সি. × ১.২ মি. - ১.৫ মি. আকারের বেড তৈরি করতে হবে। বেডটি ৫০-৬০ সে.মি. গভীর করে খুড়ে উপরের ২০

সে.মি.গভীরতার মাটি ও মধ্য স্তরের ২০ সে.মি.গভীরতার মাটি গর্তের দুপাশে রাখতে হবে। শেষের ২০ সে.মি. গভীরতার মাটি না তুলে ভালো করে কুপিয়ে প্রতি বর্গমিটারে ২০ কেজি গোবর সার, ৫০ গ্রাম টি.এস.পি এবং ৫০ গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ সার মেশাতে হয়। এর উপরে স্তরের মাটির সাথে প্রতি বর্গমিটার ২০ কেজি গোবর সার, ১০০ গ্রাম টি.এস.পি, ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ১০০০ গ্রাম এম.পি. সার মিশিয়ে গর্তে দিতে হবে। মধ্য স্তরের মাটির সাথে বর্গমিটারে ২০ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম সরিষার খৈল, ১০০ গ্রাম হাড়ের গুড়া, ৫০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৫০ গ্রাম এম.পি সার মিশিয়ে উপরের স্তর ভরাট করতে হবে। বেডগুলো সমতল থেকে যেন ২০ সে.মি. উপরে হওয়া উচিত। মাদায় করলে ৬০ সে.মি.× ৬০ সে.মি. গর্ত তৈরি করে তাতে ১০ কেজি গোবর সার, ১০০ গ্রাম হাঁড়ের গুড়া, ৫০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৫০ গ্রাম এম.পি সার মিশিয়ে উপরের ২০ সি.মি. স্তর ভরাট করে দিতে হবে।

গোলাপের বংশ বিস্তার

বীজ, শাখা কলম, দাবা কলম এবং চোখ কলম এর মাধ্যমে গোলাপের বংশ বিস্তার করা হয়। তবে সংকর জাত উদ্ভাবনের জন্য বীজ মাধ্যমে বেছে নেয়া হয়। সাধারণত: উন্নত জাতের গোলাপ এর মাধ্যমে চোখ কলম বংশ বিস্তার করানো হয়। বাংলাদেশে নভেম্বর থেকে জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময় এ চোখ কলম করা হয়।

চারা রোপণ পদ্ধতি

অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত চারা লাগানোর উত্তম সময়, চারা লাগানোর পূর্বে শুকনো ডাল কেটে ফেলে বেডে বা টবে লাগাতে হবে। এমনভাবে লাগাতে হবে যেন কলমের জোড়ার স্থানটি ঠিক মাটির উপর যায়। গোলাপের চারা লাগানোর হাইব্রিডটি এর জন্য ৭৫-১০০ সে.মি. বা খর্বাকৃতি জাত এর জন্য ৪৫-৫০ সে.মি. দূরত্ব বাঞ্ছনীয়।

আগাছা দমন ও শাখা ছাঁটাই (প্রুনিং)

সব সময় গোলাপ এর বেড আগাছা মুক্ত রাখা হবে। উত্তম ফুল পাওয়ার জন্য সেপ্টেম্বর এর মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর মাস এর মধ্যে প্রুনিং করতে হবে। শুকনো বা রোগাক্রান্ত ডালপালা কেটে দেয়া হয়। নতুন শাখা বের হলে ফুল ফোটা শুরু হয়।

পানি সেচ

প্রুনিং এর পর গাছের গোড়ার চারদিক হতে ২০ সে.মি. মাটি সরিয়ে এক পার্শ্বে রেখে দিয়ে রৌদ্র ও বাতাসে উন্মুক্ত রাখতে হবে। এর ৮-১০ দিন পরে গাছ প্রতি ৫ কেজি গোবর সার, ১০০ গ্রাম হাড়ের গুড়া, ৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৫ গ্রাম এমপি সার মিশিয়ে দিয়ে গাছের গোড়ায় ভালোভাবে সেচ দিতে হবে।

রোগ দমন

গোলাপের শিকড় পঁচা রোগ দেখা যায়। এ রোগ হলে চারা গাছের গোড়ায় কালো দাগ পড়ে, পরিশেষে চারা মারা যায়। বীজতলার মাটি ক্যাপটান দ্বারা শোধন করলে এ রোগ অনেকটা দমন হয়।

পাউডারি মিলডিউ রোগ গোলাপ গাছে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। এই রোগে আক্রান্ত গাছের পাতার নিচে এবং শাখায় ছাই রং এর পাউডারের প্রলেপ দেখা যায়। সাফলার জাতীয় ছত্রাক নাশক প্রয়োগ করা হয়।

পোকামাকড় দমন

গোলাপের মিলিবাগের আক্রমণ দেখা যায়। এই পোকা আক্রমণ করলে মোমের ন্যায় গুড়া লেগে থাকে। পাতার তলদেশে চুনের মত পদার্থ দেখা যায়। এরা পাতার রস শোষণ করে। ম্যালথিয়ন স্প্রে করলে মিলিবাগ ধ্বংস হয়।

জাব পোকা গোলাপের পাতা, ফুল এর রস শোষণ করে খায়। এ পোকা দমনের জন্য ম্যালথিয়ন স্প্রে করতে হবে।

ফুলসংগ্রহ

ফুল আধা ফোটা অবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে। তবে দুর-দুরান্তে বা কয়েকদিন পর ব্যবহারের জন্য হলে গোলাপের ফুলের কুঁড়ি যখন সম্পূর্ণ রং ধারণ করে কিন্তু ফোটেনি এমন সময় ফুল সংগ্রহ করা উচিত। কাট ফ্লাওয়ার বা কাটা ফুল হিসেবে ফুল লম্বা শাখা পাতাসহ ধারালো ছুরি দিয়ে কাটতে হয়। ফুল চয়নের কাজটি হয় খুব সকালে বা শেষ বিকেলে করা উচিত। ফুল সংগ্রহের পর শাখা পানিতে ডুবিয়ে নিম্নতাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শ্রেণি কক্ষে গোলাপ চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করুন ।

সারসংক্ষেপ

গোলাপ ফুলকে ফুলের রাণী বলা হয়ে থাকে । এর কোমলতা, বর্ণ, সুগন্ধ এমন কেউ নেই যাকে আকৃষ্ট করে না । সাজ সজ্জায় কাটা ফুল হিসেবে কদর রয়েছে । এছাড়া সুগন্ধি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয় । পৃথিবী জুড়ে গোলাপের অসংখ্য জাত রয়েছে । জাতগুলোর কোনোটির গাছ বড়, কোনোটি ঝোপালো, কোনোটি লতানো । শাখা কলম, দাবা কলম এবং চোখ কলম এর মাধ্যমে গোলাপের বংশ বিস্তার করা হয় ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১ । গোলাপের বংশবিস্তার সাধারণত কিসের মাধ্যমে করা হয়?

ক) বীজ খ) কলম

গ) মুল ঘ) কান্ড

২ । গোলাপের ফুল কোন অবস্থায় সংগ্রহ করা উচিত?

ক) ফোঁটা অবস্থায় খ) কুঁড়ি অবস্থায়

গ) আধা ফোটা অবস্থায় ঘ) পুরো পুরি ফোটা অবস্থায়

পাঠ-৮.৭ বেলী ফুলের চাষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বেলী ফুলের ব্যবহার করতে পারবেন;
- বেলী ফুলের জাত ও বংশবিস্তার বর্ণনা করতে পারবেন;
- বেলী ফুলের চাষ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	বেলী, সুগন্ধি, দাবা কলম, অঙ্গ ছাঁটাইকরণ

বেলী আমাদের দেশের অতি পরিচিতি ফুল । সুগন্ধ ও মনোমুগ্ধকর সাদা রং এর জন্য সবার কাছে প্রিয় ফুল । মেয়েরা তাদের চুলে বা খোপা সাজানোর জন্য বেলী ফুলের মালা ব্যবহার করে থাকে । এটা ঝোপালো প্রকৃতির হয়ে থাকে । বেলী ফুল থেকে সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি হয় বলে এটি অর্থকরী ফুল ।

জাত

বেলী সাধারণত তিন শ্রেণির হয় যেমন :

- ফুল সিঙ্গেল এবং অধিক গন্ধযুক্ত ।
- ফুল মাঝারী আকার এবং ডাবল ধরণের ।
- ফুল বড় আকারের ডাবল ধরণের হয় ।

জলবায়ু ও মাটি

বেলী উষ্ণ ও মাঝারী উষ্ণ আবহাওয়ায় এ ফুল ভাল জন্মে । প্রচুর সূর্যালোকযুক্ত জায়গায় বেলী চাষ করলে ফুল বেশি পাওয়া যায় । যে কোন মাটিতে জন্মে থাকে । তবে সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটি বেলীর ফুলের জন্য উপযোগী ।

বংশ বিস্তার

বেলী সাধারণত: শাখা কলম ও দাবা কলমের সাহায্যে বংশ বিস্তার করা হয় ।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি ৪-৫টি চাষ দিয়ে ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে । জমি তৈরির সময় জৈব বা গোবর সার, ইউরিয়া, ফসফেট এবং এমওপি প্রয়োগ করতে হবে । গাছের বৃদ্ধি শুরু হলে প্রতি সারি গাছ থেকে একটু দূরে মাটি আলাদা করে গাছ প্রতি ৩ কেজি গোবর সার, ১০ গ্রাম টিএসপি, ১০ গ্রাম এমওপি সার উপরি প্রয়োগ করলে ভালো ফলন দেয় ।

চারা তৈরি বা কলম তৈরি ও রোপণ

গ্রীষ্মের শেষ হতে বর্ষার শেষ পর্যন্ত বেলী ফুলের কলম বা চারা তৈরি করা যায় । চারা থেকে চারা ও সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি হতে হবে । চারা লাগানোর জন্য গর্ত খুঁড়ে গর্তের মাটি রোদ লাগিয়ে, জৈব সার ও কাঠের ছাই গর্তের সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে । এরপর প্রতি গর্তে বেলির কলম চারা বসাতে হবে । বর্ষায় বা বর্ষার শেষের দিকে কলম বসানোই ভালো । তবে সেচের ব্যবস্থা ভালো হলে বসন্তকালেও কলম তৈরি করা যায় ।

জুলাই বা আগস্ট মাসে প্রায় এক বছর বয়স্ক শাখাকে ২০-২৫ সে.মি. কেটে ২৫ সে.মি. গভীর করে ৭৫-৯০ সে.মি. লাইন থেকে লাইনে চারা থেকে চারার দূরত্ব রেখে লাগাতে হবে । দাবা কলম তৈরির পর কলম কেটে একই পদ্ধতিতে চারা লাগাতে হবে । টবের মধ্যে সব সার একসাথে মাটির সাথে মিশিয়ে টবে চারা রোপণ করা যায় ।

আন্তঃপরিচর্যা :

- সেচ দেওয়া: বেলী ফুলের চাষে জমিতে সবসময় রস থাকা গ্রীষ্মকালে ১০-১২ দিন পরপর, শীতকালে ১৫-২০ দিন পরপর ও বর্ষাকালে বৃষ্টি সময় মতো না হলে জমির অবস্থা বুঝে ২-১ টি সেচ দেওয়া দরকার ।
- আগাছা দমন: জমি বা টব থেকে নিয়মিত আগাছা পরিস্কার করতে হবে । খড় কেটে কুচি করে জমিতে বিছিয়ে রাখলে সেচের প্রয়োজন কম হয় এবং আগাছাও বেশি জন্মাতে পারে না ।
- অঙ্গ ছাঁটাইকরণ: প্রতি বছরই বেলী ফুলের গাছের ডালপালা ছাঁটাই করা দরকার । শীতের মাঝামাঝি সময় ডাল ছাঁটাই করেত হবে । মাটির উপরের স্তর থেকে ৩০ সেমি উপরে বেলী ফুলের গাছ ছাঁটাই করতে হবে । অঙ্গ ছাঁটাইয়ের কয়েকদিন পর জমিতে বা টবে সার প্রয়োগ করতে হবে ।

পোকামাকড় ও রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা

বেলী ফুল গাছে তেমন ক্ষতিকর পোকা দেখা যায় না । তবে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে । এদের আক্রমণে পাতার সাদা আস্তরণ পড়ে, আক্রান্ত পাতাগুলো কুঁকড়ে যায় ও গোল হয়ে পাকিয়ে যায় । গন্ধক গুড়া বা গন্ধক ঘটিত মাকড় নাশক যেমন:- কেলথেন পাতায় ছিটিয়ে মাকড় দমন করা যায় । বেলী ফুলের পাতায় হলদে বর্ণের ছিটে ছিটে দাগযুক্ত এক প্রকার ছত্রাক রোগ দেখা যায় । ট্রেসেল-২ প্রয়োগ করে এ রোগ দমন করা যায় ।

ফলন

ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে । ফলন প্রতি বছর বাড়ে । লতানো বেলীতে ফলন আরও বেশি হয় । সাধারণত: ৫-৬ বছর পর গাছ কেটে নতুন চারা লাগানো হয় ।

চারা লাগানো

জুলাই বা আগস্ট মাসে প্রায় এক বছর বয়স্ক শাখাকে ২০-২৫ সে.মি. কেটে ২৫ সে.মি. গভীর করে ৭৫-৯০ সে.মি.লাইন থেকে লাইনে চারা থেকে চারার দূরত্ব রেখে লাগাতে হবে । দাবা কলম তৈরির পর কমল কেটে একই পদ্ধতিতে চারা লাগাতে হবে । টবের মধ্যে সব সার একসাথে মাটির সাথে মিশিয়ে টবে চারা রোপন করা যায় ।

পরিচর্যা

বেলী লাগানোর প্রথম দিকে বেশি যত্নের প্রয়োজন হয় । প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসে ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে । ১০-১৫ দিন অন্তর অন্তর গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমে সেচ দিতে হবে । বর্ষাকালে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে । আগাছা জন্মালে তা পরিষ্কার করে দিতে হবে । প্রথম বছর গাছের ফুলের কুঁড়ি ভেঙ্গে দিতে হবে । এর ফলে দেখা যাবে দ্বিতীয় বছরে শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রচুর ফুল দেয় । প্রতি বছর শীতের শেষের দিকে কিছু ডাল পালা ছাঁটাই করতে হয় । বেলী ফুলের তেমন পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা যায় না । তবে মাঝে মাঝে মাইটস এর প্রাদূর্ভাব দেখা যায় । এক্ষেত্রে কেলথেন প্রয়োগ করা যায় ।

ফলন

সাধারণত মার্চ - আগস্ট পর্যন্ত বেলী ফুল ফোটে । কাট ফ্লাওয়ারের জন্য সাদা রং এর কুঁড়ি ফুল কুঁড়ি সন্ধ্যার আগে সংগ্রহ করে বাজারজাত করা উচিত ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বেলী ফুলের চাষপদ্ধতি বর্ণনা করবে ।

সারসংক্ষেপ

বেলী ফুলের সুগন্ধ ও মনোমুগ্ধ সাদা রং এর জন্য সবার কাছে প্রিয় ফুল । বেলী সাধারণত তিন শ্রেণির হয়ে থাকে । দাবা কলমের সাহায্যে বেলী ফুলের চারা করা হয় । শীতের চাষের দিকে কিছু জলপালা ছাঁটাই করতে হয় । সাধারণত মার্চ-আগষ্ট পর্যন্ত বেলী ফুল ফোটে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কোন শ্রেণির বেলীতে সাধারণত সুগন্ধযুক্ত হয়?

ক) সিঙ্গেল খ) মাঝারি আকার

গ) বড় আকার ঘ) ডাবল

২। কোন মাসে বেলী ফুল ফোটে?

ক) নভেম্বর-জানুয়ারি খ) মার্চ-আগস্ট

গ) সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ঘ) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

৩। কিসের মাধ্যমে বেলীর চারা উৎপাদন করা যায়?

ক) দাবা কলম খ) চোখ কলম

গ) ভিনিয়ার ঘ) বীজের মাধ্যমে

পাঠ-৮.৮ কলা চাষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কলার জমি ও জাত নির্বাচন করতে পারবেন;
- জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি জানতে পারবেন;
- কলার বংশ বিস্তার মাধ্যম ও পদ্ধতি সম্বন্ধে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	কলা, আনাজী কলা, সোর্ড সাকার, ওয়াটার সাকার, পানামা রোগ, কাদি

ভূমিকা

কলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। শুধু বাংলাদেশকেই নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অন্যতম একটি ফল। কলা জনপ্রিয়, সস্তা ও সুস্বাদু ফল। এতে মানবদেহের প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কলার অনেক জাত সেগুলো সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কলা গাছের গুড়ি কন্দ মাটির নীচে থাকে এটিই আসল কান্ড। পাতার পাতাগুলি শক্ত ও ঘনভাবে বিন্যস্ত হয়ে ভুয়াকান্ডে পরিণত হয়।

কলার জমি নির্বাচন

কলার জন্য পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধা আছে এমন জমি কলা চাষের জন্য উপযোগী। তবে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা আছে এমন জমি উত্তম।

জাত নির্বাচন

পৃথিবীতে অনেক চাষযোগ্য জাত রয়েছে। বাংলাদেশে কলার জাত সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. পাকা অবস্থায় খাওয়ার উপযোগী কলা

২. আনাজী বা সবজি কলা

১। পাকা অবস্থায় কলার জাত হল- অমৃত সাগর, সবরী, অগ্নীসর, মেহের সাগর, চাম্পা, চিনি চাম্পা, কবরী, এঁটে কলা (বীজযুক্ত কলা)।

২। আনাজী কলা গুলো হল- ভেড়ারভোগ, চোয়াল পউশ, বেহুলা, মন্দিরা ইত্যাদি।

জমি তৈরি

কলার মূল ততটা গভীর না হলেও বিস্তারশীল। মাটিতে শিকড় যাতে ভালোভাবে ছড়িয়ে যেতে পারে সেজন্য ভালো করে তৈরি করে নিতে হবে। এরপর ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে কাঠি পুঁতে রোপণের অবস্থান ঠিক করে নিতে হবে। কাঠিকে কেন্দ্র করে ৫০ সে.মি.× ৫০ সে.মি. গভীর করে গর্ত খুঁড়তে হয়। ১০-১৫ দিন গর্ত উম্মুক্ত রাখতে হবে। উপরের মাটির সাথে জৈব সার মিশিয়ে গর্তে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

কলা গাছে প্রতি বছরে ১২ কেজি গোবর সার, ইউরিয়া ১২০ গ্রাম, টিএসসি ২৫০ গ্রাম, এমপি ১২০ গ্রাম, জিপসাম ১১০ গ্রাম এবং জিংক সালফেট ২৫ গ্রাম দেয়ার জন্য বলা হয়ে থাকে। জমি তৈরি শেষ হলে অর্ধেক গোবর জমিতে ছিটিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা রোপণ করলে ২৫০০ গাছের জন্য হেক্টরে ৩০ টন গোবর সার প্রয়োজন। বাকি অর্ধেক গোবর সার, সম্পূর্ণ টিএসপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট চারা রোপণের আগে মাটির সাথে

মিশাতে হবে। চারা রোপণের দুই মাস থেকে চার মাস পরে অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক এমপি উপরি প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া ফুল আসার আগে গাছের গোড়ায় দিতে হবে।

বংশ বিস্তার

কলার বংশ বৃদ্ধি সাধারণত : অযৌন উপায়ে মাটির নীচ থেকে উৎপন্ন চারা বা সাকার দ্বারা হয়ে থাকে। দুই প্রকারের সাকার উৎপন্ন হয়-

১। সোর্ড বা অসি সাকার: এটি প্রশস্ত গুড়িকন্দ, পাতাগুলি সরু বা তরবারি আকৃতির। এগুলো মাতৃ গুড়িকন্দ থেকে উৎপন্ন হয়।

২। পানি বা ওয়াটার সাকার : এর পাতাগুলি চওড়া, গুড়িকন্দ ছোট। এটি মাতৃ গুড়িকন্দের গুড়িকন্দের গভীরে পার্শ্বমুকুল থেকে উৎপন্ন হয়।

চিত্র: ৮.৮.১: সোর্ড সাকার

চিত্র: ৮.৮.২: পানি বা ওয়াটার সাকার

চারা নির্বাচন

বংশ বৃদ্ধির জন্য সোর্ড সাকার ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। কারণ সোর্ড সাকারে গাছের বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট খাদ্য জমা থাকে।

চারা রোপণ পদ্ধতি

যে কোন সময় চারা রোপণ করা যায় তবে সেপ্টেম্বর নভেম্বর পর্যন্ত চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। কারণ এ সময় মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকে। পূর্বে তৈরিকৃত গর্তের ঠিক মাঝখানে চারা রোপণ করতে হবে। রোপণের গভীরতা ১৫-২০ সে.মি. এবং মধ্যে ভালো। তবে চারাটি মাতৃ গুড়িকন্দের সাথে মাটিতে যত গভীরে ছিল, ঠিক ততটুকু গভীরে রোপণ করা ভালো।

আগাছা দমন

গাছের বৃদ্ধির প্রথম পর্যায় বিশেষ করে ৩-৪ মাস কলা বাগান আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। যেহেতু মূল মাটির অল্প গভীরে থাকে সেজন্য আগাছা গাছের বৃদ্ধিকে ব্যহত করে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন

শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন অন্তর অন্তর সেচ দিতে হবে। কলার জমি একেবারে শুকিয়ে যেতে দেয়া উচিত নয়। প্লাবন বা নালা যে কোন পদ্ধতিতে সেচ দেয়া যেতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত বা বর্ষার সময় পানি জমতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

রোগ দমন

কলার পানামা রোগ (*Fusarium wilt*) একটি মারাত্মক রোগ। অমৃতসাগর ও সবরিতে এ রোগের আক্রমণ বেশী। এটি মাটি বাহিত রোগ। এ রোগে প্রথমে নিচের পাতা হলুদ হয়ে যায়, দ্রুত রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং গাছ মারা যায়। আক্রান্ত গাছ মাটিসহ উপড়ে দুরে ফেলতে হবে। একই জমিতে ৩-৪ বছর কলাগাছ না করাই ভালো।

পোকা দমন

কলার পাতা এবং ফলের বিটল এর পূর্ণাঙ্গ পোকা কচি পাতা বা কচি ফল এর উপরে নরম অংশ চেঁচে খেয়ে ফেলে। সুতরাং কাদি বের হওয়ার পরপর সবুজ পলিথিন দ্বারা বা অন্য কোন স্বচ্ছ ব্যাগ দ্বারা কাদি ঢেকে দিতে হবে। এতে সূর্যালোকে গরম বাতাস-ধুলোবালি পোকার হাতে থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং থোড় কেটে দিতে হবে। এছাড়া ১০ গ্রাম কার্বোফুরান গাছের চারদিকের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সাথী ফসল চাষ

চারা রোপনের ১ম ৪/৫ মাস বলতে গেলে জমি ফাকাই থাকে। এ সময় কলাবাগানে অর্ন্তবর্তী ফসল হিসেবে মিষ্টি কুমড়া শসা ও বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি (মূলা, পালং শাক, মরিচ, ছোলা, মসুর, বরবটি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাল শাক, ডাটা) চাষ করা যেতে পারে।

খুঁটি/ঠেস দেওয়া

কলা গাছে ছড়া আসার পর বাতাসে গাছ ভেঙ্গে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাঁশ বা গাছের ডাল দিয়ে খুঁটি বেঁধে দিলে ছড়া ভেঙ্গে পড়া রোধ হয়।

অতিরিক্ত চারা (সাকার) কর্তন

কলাগাছের গোড়া হতে নতুন সাকার/চারা বের হয়ে থাকে। কলাগাছে ছড়া বের হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই সাকার রাখা উচিত নয়। সাধারণত: দু'এক মাস পরপর এসব চারা মাটির সমান করে কাটা দরকার। কাদি সম্পূর্ণ বের হওয়ার পর মুড়ি ফসলের জন্য গাছ প্রতি মাত্র একটি চারা রেখে বাকিগুলো কাটতে হবে।

ফল সংগ্রহ

ফুল বের হবার ৯০ থেকে ১৩০ দিনে কলা সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। কলা পরিপক্ক হলে এর শিরাগুলো সমান হয়ে যায় এবং ফ্যাকাশে সবুজ রং ধারণ করে। এরকম অবস্থায় কাদি কেটে নামানো হয়। কাদি বা ফানাগুলোকে ঘরে উপর রেখে তারপর খড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এতে কলা সমানভাবে পাকে ও রং চমৎকার হয়।

ফলন: হেক্টর প্রতি সাধারণত ২০-২৫ টন ফলন হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী কলার বংশবিস্তারের জন্য বিভিন্ন ধরনের সাকার সনাক্ত করে এর চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

কলার মানবদেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কলা গাছের গুড়ি কন্দ মাটির নীচে থাকে এটিই আসল কান্ড। বাংলাদেশে কলার জাত সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) পাকা অবস্থায় খাওয়ার উপযোগী কলা (২) আনাজী বা সবজি কলা অযৌন উপায় মাটির নীচ থেকে উৎপন্ন চারা বা সাকার দ্বারা হয়ে থাকে। ফুল বের হবার ৯০ থেকে ১৩০ দিনে কলা সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। পাকা অবস্থায় কলার জাত-
(ক) অমৃত সাগর (খ) বেহুলা
(খ) চয়াল পৌউশ (ঘ) ভেড়ারভোগ

২। কলার চারা কত দূরত্ব পরপর লাগানো উচিত-
(ক) ২ মি. × ২ মি. (খ) ৪ মি. × ৪ মি.
(গ) ২ মি. × ৩ মি. (ঘ) ৩ মি. × ৩ মি.

৩। পাতা চিকন, প্রশস্ত গুড়ি কন্দ কোন প্রকারের আকারের-
(ক) সোর্ড সাকার (খ) পানি সাকার
(গ) সোর্ড ও পানি সাকার (ঘ) ওয়াটার সাকার

৫। কলার মারাত্মক রোগ
ক) পানামা রোগ খ) লেইট-ব্লাইট রোগ
গ) ব্লাক মোল্ডরট ঘ) এনথ্রাকনোজ রোগ

৬। কলার পাতা ও ফলের বিটল থেকে রক্ষার জন্য কি দ্বারা ঢেকে দিতে হয়?
ক) কালো পলিথিন দ্বারা খ) স্বচ্ছ নীর পলিথিন দ্বারা
গ) চটের বস্তা দ্বারা ঘ) খড় দ্বারা

পাঠ-৮.৯ আনারস চাষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আনারসের উৎপত্তিস্থান, উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- জাত ও বংশবিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।
- জলবায়ু ও মাটি বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	আনারস, হানি কুইন, জায়ান্ট কিউ, গোড়াশাল, ক্রাউন, স্লিপ, সাকার

আনারস ভিটামিন এ, বি ও সি সমৃদ্ধ একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ফল । আনারস সাধারণত তাজা পাকা ফলই খাওয়া হয় । কচি ফলের শাঁস ও পাতার রস সেবন করলে কৃমি হতে রক্ষা পাওয়া যায় । এটি বলবৃদ্ধিকারী ও কাশি কফ নিরাময়ে কাজ করে । আনারস একটি যৌগিক ফল বা সরোসিস নামে পরিচিত । বাংলাদেশের সিলেট, টাঙ্গাইলের মধুপুর, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নরসিংদী এলাকায় চাষ হয় । বাংলাদেশের জাতগুলি হল হানি কুইন, জায়ান্ট কিউ, ঘোড়াশাল ও জলঢুপি নামে চাষ করে থাকে ।

হানি কুইন
এটি একটি আগাম জাত । মে-জুন মাসে ফল সংগ্রহ করা যায় । ফল খুব মিষ্টি ও রসালো হয় ।

জায়ান্ট কিউ
এটি একটি নাবী জাত । এ ফলের ওজন অন্যান্যগুলোর তুলনায় বড় অর্থাৎ ১.৫ - ৩.০ কেজি হয় । ফল মিষ্টি এবং আঁশ কম ।

ঘোড়াশাল
ঘোড়াশাল অঞ্চলে হয় বলে এর নাম ঘোড়াশাল হিসেবে পরিচিত । অন্য জাতের তুলনায় টক হয় । ফল মে-জুন মাসে আহরণের উপযোগী হয় ।

বংশ বিস্তার
আনারস সাধারণত অঙ্গজ উপায়ে বংশ বিস্তার হয়ে থাকে । যেমন সাকার বা কান্ডের চারা, গোড়ার চারা, স্লিপ (চারা ফলের বোঁটা থেকে বের হয়), ক্রাউন (Crown) (ফলের উপরের ছোট পাতার সমন্বয়ে গঠিত), স্টাম্প বা কান্ড দ্বারা বংশ বিস্তার করা হয় । তবে সাকার বা কান্ডের চারা দ্বারা বংশ বিস্তারের চারা উত্তম ।

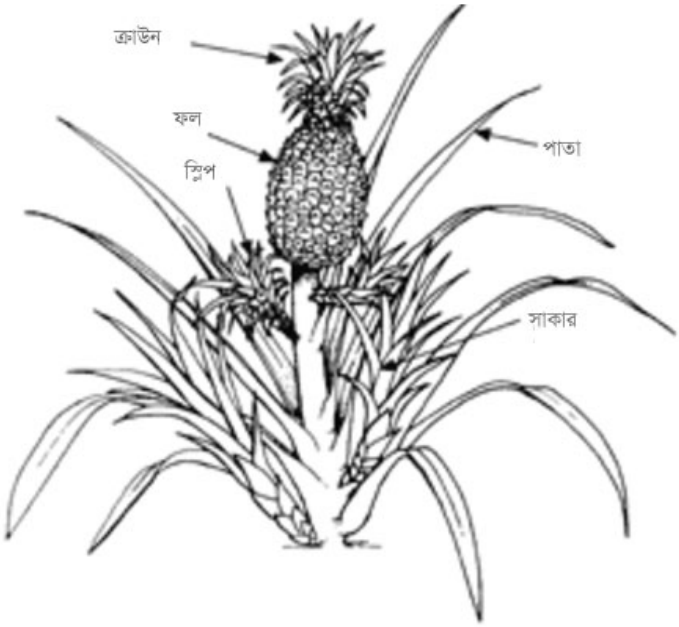

চিত্রঃ ৮.৯.১ঃ আনারসের বিভিন্ন অংশসমূহ

জলবায়ু ও মাটি

বাংলাদেশের সব জায়গায় আনারস চাষ হতে পারে। যেহেতু আনারস জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না সে জন্যই সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের ঢালে আনারস চাষের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। সুনিষ্কাশিত, উর্বর জমি আনারসের জন্য ভালো। তবে দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি বেশ উপযোগী। মাটির pH ৪.৫ থেকে ৬.৫ হলে আনারস গাছ বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে ভালো।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

পাহাড়ে চাষ করলে চাষের তেমন প্রয়োজন পড়ে না। তবে সমতল উচু জমিতে চাষের প্রয়োজন পড়ে। গাছ প্রতি সারের পরিমাণ পঁচা আবর্জনা বা গোবর সার ২০০-৩০০ গ্রাম, ইউরিয়া ১৫-২০ গ্রাম, টিএসপি ১০-১৫ গ্রাম, এমওপি ২৫-৩৫ গ্রাম, জিপসাম ১০-১৫ গ্রাম। গোবর, টিএসপি ও জিপসাম চারা রোপনের পূর্বেই মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার দু'মাস পরপর ৪-৫ কিস্তিতে দিতে হবে।

চারা রোপন

চারা যদি এক সারিতে রোপন করা যায়- তাহলে সারি থেকে ৫০ সে.মি. দূরে দূরে চারা লাগানো যায়। তবে দুই সারি পদ্ধতি দূরত্ব একটু বেশি লাগে। দুই সারি পদ্ধতিতে চারা রোপন করা ভালো। চারা ৫-৭ সে.মি. গভীরে রোপন করলে। বেশির ভাগ চারা সেপ্টেম্বর - অক্টোবরে পাওয়া যায় সেজন্য অক্টোবর-নভেম্বর চারা লাগানো উপযুক্ত সময়।

পরিচর্যা

আনারস গাছে তেমন সেচের প্রয়োজন পড়ে না। তবে শুষ্ক মৌসুমে কিছু সেচ দেয়া প্রয়োজন। আগাছা আনারসের মরা ও শুকনো পাতা পরিষ্কার করতে হবে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চারা ভাঙ্গার কাজ করতে হয়। আনারসের তেমন পোকামাকড় রোগ বালাই নাই। তবে Heart tro নামক পঁচা রোগ হলে ০.২% রিডোমিল প্রয়োগ করা যেতে পারে। ছাতরা পোকা এবং পিঁপড়া দূর করার জন্য ম্যালাথিয়ণ ৫৭ ইসি ব্যবহার করা যায়।

ফল সংগ্রহ ও ফলন

চারা লাগানোর এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে ফুল আসে। জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে আনারস পাকে। ফলন পাকতে শুরু করলে সবুজের অংশ কমে গিয়ে হলুদাভাব রং ধারণ করলেই ফল সংগ্রহ শুরু করা উচিত। বোঁটার সামান্য অংশসহ ফল সংগ্রহ করা হয়। আনারসের ফলন হেক্টর প্রতি এবং জাত ভেদে ২৫-৫০ টন পর্যন্ত হতে পারে।

বছর ব্যাপী আনারস উৎপাদন প্রযুক্তি (হরমোন প্রয়োগ)

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় সাধারণত চারা রোপনের ১৫-১৬ মাস পর আনারসের গাছে ফুল আসে ও ফুল আসার ৪-৫ মাস পর ফল পাকে। সাধারণত: জুন-জুলাই মাস আনারস পাকার সময়। এসময় আমাদের দেশে আম, কাঁঠাল, কলা, পেয়ারা, প্রভৃতি ফলেরও ভরা মৌসুম। ফলে এ সময় আনারসের বাজার মূল্যও কম থাকে। বছরের অন্যান্য সময়ে এর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন না থাকায় তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। হরমোন প্রয়োগ করে সারা বছর আনারস উৎপাদন করে এ সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। অর্থাৎ অমৌসুমী আনারস পাওয়ার জন্য হরমোন প্রয়োগ করে ফুল-ফল নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী আনারস বাগান পরিদর্শন করে এ চাষ পদ্ধতির উপর প্রতিবেদন করবেন।

সারসংক্ষেপ

আনারস অনন্য স্বাদের একটি রসালো ফল। আনারসের তিনটি জাত হানি কুইন, জায়ান্ট কিউ, ঘোড়াশাল ও জলঢুপি বহুল প্রচলিত। বিভিন্ন উপায়ে অঙ্গউজ বংশ বিস্তার করা যায় তবে সাকারের মাধ্যমে বংশ বিস্তার সহজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৯

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। আনারস কোন জাতীয় ফল?
(ক) সরল ফল (খ) যৌগিক ফল
(খ) মিশ্র ফল (ঘ)

২। আনারসের বংশ বিস্তার কিসের মাধ্যমে হলে ভালো?
(ক) সাকার বা কান্ডের চারা (খ) স্লিপ
(গ) ক্রাউন (ঘ) স্টাম্প

৩। আনারসের ফলের উপরে ছোট পাতার সমন্বয়ে গঠিত অংশকে কি বলে?
(ক) স্লিপ (খ) ক্রাইন
(গ) সাকার (ঘ) স্টাম্প

পাঠ-৮.১০ ধান/পাট ফসলের বিভিন্ন উপকারি ও অপকারি কীটপতঙ্গ সংগ্রহ এবং অ্যালবাম তৈরি ।

উদ্দেশ্য: ধান/পাট পোকা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনিষ্টকারী পোকা শনাক্ত করা ।

উপকরণ:
১. পোকা ধরার হাত জাল, ২. পোকা রাখার ১টি জার ৩. কাগজ ও ৪. পেন্সিল ।

কাজের ধারা:
১. একটি হাত জাল ও একটি জার নিয়ে বিদ্যালয়ের পাশের ধান এবং পাট খেতে যাই ।
২. উভয় খেত থেকে জাল টেনে পোকা সংগ্রহ করি ।
৩. পোকাগুলো জারে রাখি ও জারের মুখ ঢাকনা দ্বারা বন্ধ করি ।
৪. জারে রক্ষিত পোকা শ্রেণিকক্ষে আনি ।
৫. পোকাগুলো একটি একটি করে বোর্ডে বইয়ের তাত্ত্বিক অংশে দেওয়া পোকার বর্ণনার সাথে মিলাই ।
৬. এবার অপকারী পোকাগুলো বোর্ড বাইয়ে দেওয়া ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নাম, ক্ষতির লক্ষণ ও প্রতিকার ভালোভাবে জেনে নিই ।

সাবধানতা:
১. পোকাগুলো সংগ্রহের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পোকাগুলোর দেহের কোন অংশ নষ্ট না হয় ।
২. পোকাগুলো ধরার ক্ষেত্রে খালি হাত ব্যবহার না করে টিমটা ব্যবহার করতে হবে ।